PGPS 2ND YEAR

1. জনপ্রশাসনে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ করুন?

আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গি অর্থ হচ্ছে মনোভাব মানসিকতা বা চিন্তার ধরন, যে-কোনো বিষয়ের যথাযথ ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের স্বার্থে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা দরকার। তাই প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞানের মত আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাতেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায়।

আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সংজ্ঞা: আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হল এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা-পর্যালোচনা পরিবর্তে মানুষের রাজনৈতিক আচরণ, আর সামাজিক বিজ্ঞানের সহযোগিতা সংখ্যায়ন, প্রকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের অভিজ্ঞতা প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আরনল্ড ব্রেখট এর মতে, আচরনবাদ হল রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে এক অভিজ্ঞতাবাদী অস্থায়ী তথ্য গঠনের প্রচেষ্টা। ডেভিড ট্রুম্যান এর মতে আচরণবাদের উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান গঠন করা। ডেভিড ইস্টন আচরণবাদকে একটি বৌদ্ধিক প্রবণতা ও নির্দিষ্ট বিদ্যাবিষয়ক আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। রবার্ট ডান এর মতে, আচরণবাদ হল এক আন্দোলন ও পদ্ধতি যা ঐতিহাসিক দার্শনিক ও প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পর্যবেক্ষণশীল আচরণের মাধ্যমে রাজনীতির ব্যাখ্যায় সচেষ্ট। এস পি ভার্মা এর মতে, আচরণবাদ হল একটি প্রশংসনীয় ও শক্তিশালী উদ্যোগ যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বিষয়ে পরিনত করতে চায়। সুতরাং আচরণবাদের সাধারণ সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন তামিকের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি। আচরণবাদ হল এমন এক আন্দোলন বা তান্ত্রিক বিপ্লব, যার প্রবক্তারা মূল্যমান নিরপেক্ষ একটি তাত্বিক কাঠামোর সাহায্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির যথাযথ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন। এই আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের মধ্যে চার্লস মেরিয়াম, ডেভিড ট্রুম্যান, হার্বার্ট সাইমন, ডেভিড ইস্টন রবার্ট ডাল, গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচরণবাদের বৈশিষ্ট্য

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আচরণবাদের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনায় অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে আচরণবাদের মাধ্যমে। বসু দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিবদ্ধ রুপ হল আচরণবাদ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ, আর সমাজবিজ্ঞান সহযাগিতা, সংখ্যায়ন ইত্যাদির ওপর আচরণবাদ জোর দেয়। আচরণবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়

[1] **তত্ব ও তথ্যকেন্দ্রিকতা:** আচরণবাদে বলা হয় যে, তমকে গবেষণার দ্বারা যাচাই করতে হবে। তারপর সেই গবেষণালব্ধ তথ্য রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করবে। এই মতবাদে তত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর গুরুত্ব আরাপে করা হয়। এখানে সিদ্ধান্তের বিশ্বাসযাগ্যেতা তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[2] **মূল্যমান নিরপেক্ষতা:** আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনাকে মূল্যমান নিরপেক্ষ করে গড়ে তুলতে চায়। যে-কোনা বৈজ্ঞানিক আলাচেনার অন্যতম শর্ত হল মূল্যমান নিরপেক্ষতা। একারণেই আচরণবাদী আলাচেনায় আদর্শ, নীতিবাধে, মূল্যবাধে প্রভৃতির কোনা েস্থান নেই।

[3] **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়াগে** আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়াগে করতে আগ্রহী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য আচরণবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনায় পরিমাপ, সংখ্যায়ন ইত্যাদির ওপর জোর দেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনায় তারা ভৌতবিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়াগে করতে চান।

[4] **আন্তঃবিষয় আলাচেনা:** রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। স্বভাবতই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনাকে সমৃদ্ধ ও সুসংহত করার জন্য আচরণবাদী দার্শনিকগণ সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। আচরণবাদ মনে করে ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণ তার সামগ্রিক আচরণের একটি অংশ। সুতরাং, ব্যক্তির সামগ্রিক আচরণ সম্পর্কে অবহিত না হলে তার রাজনৈতিক আচরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না। একারণেই, আন্তঃবিষয় আলাচেনা একান্তই আবশ্যক।

PEARL COACHING CENTER

[5] **ক্ষমতা বিষয়ক** আলাচেনা আচরণবাদ ক্ষমতা সংক্রান্ত যেকোনা কাজকে রাজনৈতিক কাজ বলে মনে করে। ক্ষমতা সংক্রান্ত কাতাকে আচরণবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনার অন্তর্ভুক্ত করতে চান। আচরণবাদ প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলাচেনার বিরাধেী হলেও আচরণবাদে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকেও স্বীকার করা হয়েছে।

[6] **ব্যক্তি ও গাষ্ঠেী আচরণ** আচরণবাদ মনে করে ব্যক্তি ও গাষ্ঠেীর আচরণকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণ হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানুষের পারস্পরিক আচরণের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে যৌথ আচরণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় যৌথ আচরণ বা গাষ্ঠেী আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

[7] **অরাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলাচেনা:** আচরণবাদ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলাচেনার বিরাধেী আচরণবাদ মনে করে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলাচেনার মাধ্যমে রাজনৈতিক আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ বিচারবিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। তাই আচরণবাদে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলাচেনার পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলাচেনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

[8] **বিপ্লব:** আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। আচরণবাদ রাষ্ট্রের পরিবর্তে ব্যক্তির আচরণের ওপর গুরুত্ব আরামে করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এ ছাড়াও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে বিজ্ঞানসম্মত করে গড়ে ভালোর কাজে আচরণবাদ সচেষ্ট।

মূল্যায়ন: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আচরণবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। চিরাচরিত রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলাচেনার পরিবর্তে ব্যক্তি ও গাষ্ঠেীর আচরণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। এদিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাচেনায় আচরণবাদকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলা যায়। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলনে আচরণবাদী আলোচনার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। এতদসত্ত্বেও মতবাদটি বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ আচরণবাদ মোটেই ত্রুটিমুক্ত নয়। বিভিন্ন দিক থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা হয়।

(১) মূল্যবোধকে অস্বীকার: সমালোচকদের মতে আচরণবাদ মানবতা-বিরোধী। এই মতবাদে মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করা হয়। আচরণবাদে সংখ্যাতত্ব ও অভিজ্ঞতাবাদী অন্যান্য কলাকৌশলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অন্ধভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে প্রযোগ করতে চায়। অর্থাৎ মানবসমাজকে একটি কৃত্রিম গবেষণাগার হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ, তালিকা প্রণয়ন, রেখাচিত্র অঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনীতিক জীবন ও কার্যাবলীর যথাযথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অসম্ভব। মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে রাজনীতিক-সামাজিক ঘটনার আলোচনা অসম্ভব। রাজনীতিক তত্ত্বের আলোচনার ভিত্তিতে মূল্যবোধের বিবেচনা বর্তমান মূল্যবোধহীন আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আগেও সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। লিও স্ট্রাউস মন্তব্য করেছেন: "It is impossible to study social phenomena... without making value-judgement."

(২) সংখ্যাতত্বের নামান্তর বিরুদ্ধবাদীরা শ্লেষাত্মকভাবে আচরণবাদকে 'সংখ্যাতত্ত্বের' নামান্তর হিসাবে অভিহিত করেন। আচরণবাদী আলোচনায় সংখ্যায়ন (quantification), রেখাচিত্র (graphs or diagrams) প্রভৃতি অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তার ফলে আচরণবাদী আলোচনা কিছু জাঁকজমকপূর্ণ কলা-কৌশলের সমষ্টি হিসাবে গণ্য হয়। সমালোচকদের মতে এইভাবে মানুষের রাজনীতিক জীবনের সঠিক অবস্থার যথাযথ পরিচয় পাওয়া মুশকিল। বল বলেছেন: "They are tools of analysis that can only be usefully employed in certain fields, and their findings have to be treated with care." অ্যানডেস্ক (Stanislav Andreski) তাঁর Social Science as Sorcery গ্রন্থে আচরণবাদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বলেছেন: full of stream lined sorceres clad in the latest parapharnelia of science." তিনি আরও বলেছেন: "...people now days talk about methodology they usually mean not the basic principles of Inductive inference, but the specific methods of collecting and analysing statistical data."

(৩) রক্ষণশীলতা: রক্ষণশীলতার প্রতি আচরণবাদে পক্ষপাতিত্ব প্রকট। এই মতবাদ সমাজের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করে। আচরণবাদ কেবল স্থিতাবস্থার ব্যাপারেই অধিক আগ্রহ দেখায়। তাই আচরণবাদকে বলা হয় স্থিতাবস্থা (status quo) বজায় রাখার ভয়। আচরণবাদ সমাজ পরিবর্তনের কারণসমূহ বা সমাজবিপ্লবের নীতি এবং সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিচার বিশ্লেষণ করেনি। সমালোচকদের মতে আচরণবাদের মূল উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়া সমাজের স্থিতাবস্থা সংরক্ষণ। অ্যানড্রেস্তি মন্তব্য করেছেন: "By diverting the eyes from the explosive issues of the day the methodological purism act in the fact as a prop of the status quo whatever it might be" আচরণবাদীরা হলেন উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক। এই রাজনীতিক ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা সংরক্ষণই হল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের কথাও তাঁরা বলেন। রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠপোষকতা এই মতবাদে একটি বড় ত্রুটি। আর একটি ক্ষেত্রে আচরণবাদের রক্ষণশীলতা প্রকটভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

আচরণবাদীরা মার্কিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এঁদের মতানুসারে এর কোনরকম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তবে সংস্কারের প্রয়োজন হতে পারে।

(৪) বিজ্ঞানসম্মত নয়। তা ছাড়া, কোন একটি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজের বাস্তব চিত্র সঠিকভাবে চিত্রিত করতে পারছে কিনা তার উপরই সংশ্লিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক চরিত্র নির্ভরশীল। "বিজ্ঞানমনস্কতা' (scientism)-র পরিচয় প্রত্যেক ঘটনার কার্যকারণগত বিষয়াদি যথাযথভাবে অনুধাবন ও বিচার-বিশ্লেষণ, সত্য উদ্ঘাটন প্রভৃতির মধ্যেই নিহিত থাকে। কেবল কিছু কলা-কৌশলের প্রয়োগকেই বিজ্ঞান বলে না। ভৌত বিজ্ঞানের অনুশীলনে কলা-কৌশলগুলির অনুসরণ করলেই কোন সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত হয়ে যায় না। এবং কেবল এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞানটির সাফল্য বা সার্থকতা প্রমাণিত হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করা ঠিক নয়। বিরুদ্ধবাদীদের মতানুসারে আচরণবাদীদের বিজ্ঞানমনস্কতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে বরং অবৈজ্ঞানিক (unscienced) করে তুলেছে। স্টানকিউজ (W.J. Stankiewicz) তাঁর Aspects of Political Theory শীর্ষক রচনায় মন্তব্য করেছেন: ...scientism has not produced anything remotely resembling a substitute for political theory."

(৫) বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবসমাজ সম্পর্কে সাধারণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সর্বজনগ্রাহ্য কোন সত্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হে থাকে। কারণ মানবসমাজের একটি সামগ্রিকতা আছে। মানবসমাজ কেবলমাত্র কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যোগফলমাত্র নয়, তার অধিক কিছু। মানব সমাজের এই সামগ্রিক সত্তাকে উপেক্ষা করে মানবসমাজ সম্পর্কিত কোন সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারে না।

(৬) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন: আচরণবাদীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আন্ত:- সামাজিক বিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনার পক্ষপাতী। এই কারণে তাঁরা সমাজতম, নৃত পরিসংখ্যান তত্ত্ব, মনোবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য মনে করেন। তার ফলে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার যাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

2. জনপ্রশাসন এ বিশ্বায়নের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর?

বিশ্বায়ন জনপ্রশাসনে বেশ কিছু ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

1. **বর্ধিত দক্ষতা:** বিশ্বায়ন নতুন প্রযুক্তির বিকাশকে সহজতর করেছে, যা জনপ্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা এখন তথ্য অ্যাক্সেস করতে, ধারনা শেয়ার করতে এবং বিশ্বজুড়ে সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।
2. **বৃহত্তর জবাবদিহিতা:** বিশ্ব অর্থনীতি জনপ্রশাসনকে নাগরিক, স্টেকহোল্ডার এবং অন্যান্য দেশের কাছে আরও দায়বদ্ধ করে তুলেছে। বর্ধিত প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃনির্ভরতার সাথে, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা তাদের কর্মক্ষমতা এবং জনসাধারণের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলতা উন্নত করতে বাধ্য হয়।
3. **বর্ধিত সহযোগিতা:** বিশ্বায়ন জনপ্রশাসকদের জন্য বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা করা সহজ করে তুলেছে। এটি ধারণা, সর্বোত্তম অনুশীলন এবং দক্ষতার আদান-প্রদানকে সহজ করেছে, যা উদ্ভাবনী নীতি এবং কর্মসূচির বিকাশের দিকে পরিচালিত করে।

4 **উন্নত পরিষেবা সরবরাহ:** বিশ্বায়ন অর্থায়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং দক্ষতার নতুন উৎসগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করেছে, যা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের পরিষেবা সরবরাহের উন্নতি করতে সক্ষম করেছে। এটি নাগরিকদের জন্য উন্নততর ফলাফলের দিকে পরিচালিত করেছে, যেমন উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং জননিরাপত্তা।

5 **বৃহত্তর স্বচ্ছতা:** বিশ্বায়ন জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতার চাহিদা বাড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উত্থানের সাথে, নাগরিকরা এখন জনপ্রশাসকদের তাদের কর্ম এবং সিদ্ধান্তের জন্য জবাবদিহি করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, বিশ্বায়ন জনপ্রশাসনে দক্ষতা, জবাবদিহিতা, সহযোগিতা, সেবা প্রদান এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যাইহোক, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বায়ন চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকিও উপস্থাপন করে, যা জনপ্রশাসকদের সতর্কতার সাথে পরিচালনা করতে হবে।

জনপ্রশাসনে অর্থনীতিকে আলিঙ্গন করার জন্য বেশ কিছু পরিবর্তন করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে:

- **অর্থনীতিতে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের শিক্ষিত করা:** পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের পাবলিক পলিসি সম্পর্কে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে। এই শিক্ষার মধ্যে মাইক্রোইকোনমিক্স, ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এবং পাবলিক ফাইন্যান্সের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- **পাবলিক পলিসি জানাতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করা:** পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের উচিত তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া জানাতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করা। এই বিশ্লেষণ তাদের সর্বজনীন নীতির লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে দক্ষ এবং কার্যকর উপায়গুলি চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারে।
- **জনপ্রশাসনে দক্ষতা ও কার্যকারিতা উন্নীত করা:** পাবলিক প্রশাসকদের উচিত জনসেবা প্রদানে দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া। এটি ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ এবং কর্মক্ষমতা পরিমাপের মতো অর্থনৈতিক সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে করা যেতে পারে।
- **সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ক্ষমতায়ন:** এই সিদ্ধান্তগুলি অজনপ্রিয় বা বিতর্কিত হলেও জনপ্রশাসকদের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সমর্থন এবং প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি।

জনপ্রশাসনে কীভাবে অর্থনীতিকে আলিঙ্গন করা যায় তার কিছু নির্দিষ্ট উদাহরণ এখানে দেওয়া হল:

- **পাবলিক প্রকল্পের মূল্যায়নের জন্য খরচ-সুবিধা বিশ্লেষণ ব্যবহার করা:** খরচ-সুবিধা বিশ্লেষণ হল একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ার যা প্রস্তাবিত পাবলিক প্রকল্পগুলির খরচ এবং সুবিধাগুলি মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই তথ্যগুলি জনপ্রশাসকদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে যে কোন প্রকল্পগুলি অনুসরণ করা উচিত এবং কোনটি পরিত্যাগ করা উচিত।
- **পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি উন্নত করতে পারফরম্যান্স পরিমাপ ব্যবহার করা:** পারফরম্যান্স পরিমাপ হল পাবলিক প্রোগ্রাম এবং এজেন্সিগুলির পারফরম্যান্সের ডেটা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়া। এই তথ্যটি এমন ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে উন্নতি প্রয়োজন এবং সময়ের সাথে সাথে অগ্রগতি ট্র্যাক করতে।
- **কাঙ্ক্ষিত আচরণকে উন্নীত করার জন্য অর্থনৈতিক প্রণোদনা ব্যবহার করা:** অর্থনৈতিক প্রণোদনা সরকারি খাতে পছন্দসই আচরণের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, সরকারগুলি ব্যবসায়কে নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ করতে বা স্বল্প আয়ের কর্মী নিয়োগে উৎসাহিত করতে ট্যাক্স বিরতি ব্যবহার করতে পারে।
- **পাবলিক সেবা প্রদানের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবহার করা:** পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপগুলিকে আরও দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে জনসেবা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, নতুন রাস্তা বা স্কুল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য সরকার বেসরকারি কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্ব করতে পারে।

জনপ্রশাসনে অর্থনীতিকে আলিঙ্গন করা সরকারগুলিকে পাবলিক নীতি সম্পর্কে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে, জনসেবা প্রদানের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে।

3.বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া ভারতীয় প্রশাসনের উপর কী রুপ প্রভাব ফেলেছে ?

Or উদারীকরণ ভারতীয় প্রশাসনে যে প্রভাব ফেলেছে তার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করুন?

PEARL COACHING CENTER

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া ভারতীয় প্রশাসনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভা কব ফেলেছে, যা শাসন, নীতি-নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করে। এখানে কিছু মূল উপায় রয়েছে যা বিশ্বায়ন ভারতীয় প্রশাসনকে প্রভাবিত করেছে:

1.**অর্থনৈতিক উদারীকরণ:** বিশ্বায়ন ভারতের অর্থনৈতিক নীতিগুলি গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে 1990 এর দশকে গৃহীত অর্থনৈতিক উদারীকরণ উদ্যোগের মাধ্যমে। বাণিজ্য বাধা দূর করা, বিদেশী বিনিয়োগের জন্য ভারতীয় বাজার উন্মুক্ত করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎসাহ ভারতকে আরও বাজারমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে। এই পরিবর্তনের ফলে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, শিল্পের সম্প্রসারণ হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে একীভূত হয়েছে।

2.**নীতি সংস্কার:** বিশ্বায়ন ভারতীয় প্রশাসনকে আন্তর্জাতিক মান ও অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য নীতি সংস্কার প্রবর্তন করতে প্ররোচিত করেছে। এই সংস্কারগুলি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ, কর, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার এবং শ্রম আইনের মতো খাতগুলিতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রশাসন নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করে আরও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করেছে।

3.**শাসনের চ্যালেঞ্জ:** বিশ্বায়ন ভারতীয় প্রশাসনের জন্য শাসন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। বিদেশী পুঁজির দ্রুত প্রবাহ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং বৈশ্বিক নেটওয়ার্কগুলিতে ভারতীয় ব্যবসার একীকরণের ফলে ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা এবং শোষণ রোধ করার জন্য কার্যকর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার বিকাশের প্রয়োজন হয়েছে। আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য, বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রবাহের মতো জটিল আন্তঃজাতিক সমস্যাগুলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রশাসনকে তার ক্ষমতা বাড়াতে হয়েছে।

4.**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি:** বিশ্বায়ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে (ICTs) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এনেছে, যা ভারতীয় প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। আইসিটি সরকারী প্রক্রিয়ার দক্ষতা ও স্বচ্ছতা উন্নত করেছে, ই-গভর্নেন্স উদ্যোগকে সক্ষম করেছে এবং নাগরিকদের কাছে উন্নত সেবা প্রদান করেছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলির মতো প্রযুক্তিগুলি প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলিকে স্ট্রিমলাইন করতে, পাবলিক পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস সহজতর করতে এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উন্নীত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

5.**আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং কূটনীতি:** বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক ফোরাম এবং বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানে ভারতের সম্পৃক্ততা বাড়িয়েছে। ভারতীয় প্রশাসন বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য বৈশ্বিক সমস্যাগুলির উপর বিশ্বব্যাপী আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিশ্বায়নের জন্য কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা, আন্তর্জাতিক চুক্তির আলোচনা এবং অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং ভাগ করা উদ্দেশ্যগুলি অনুসরণ করার জন্য অন্যান্য দেশের সাথে সহযোগিতা প্রয়োজন।

6.**সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব:** বিশ্বায়নের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে, যা সামাজিক নিয়ম, মূল্যবোধ এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে। বৈশ্বিক মিডিয়া, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং ধারণার প্রবাহের বর্ধিত এক্সপোজার ভারতীয় সমাজকে আকৃতি দিয়েছে। ভারতীয় প্রশাসনকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলি মোকাবেলা করে, অন্তর্ভুক্তি প্রচার করে এবং বিশ্বায়নের প্রভাবের সাথে সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণের ভারসাম্য বজায় রেখে এই পরিবর্তনগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়েছে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতীয় প্রশাসনের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব বহুমুখী এবং জটিল, ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পরিণতি সহ। যদিও বিশ্বায়ন ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একীকরণে অবদান রেখেছে, এটি বৈষম্য, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও উপস্থাপন করেছে। ভারতীয় প্রশাসন এই গতিশীলতাগুলিকে নেভিগেট করে চলেছে, বিশ্বায়নের সুফলগুলিকে তার সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার চেষ্টা করে।